Vol. 52 | No. 1 | 2014

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

জহির রায়হানের ছোটগল্পে মধ্যবিত্তজীবন

Volume	52
Issue	1
Year	2014
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	শারমিন আক্তার
Published online	October 1, 2014
DOI	10.62328/sp.v52i1.9
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v52i1.9
Pages	২১১-২২৩
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

জহির রায়হানের ছোটগল্পে মধ্যবিত্তজীবন

Check for updates

শারমিন আক্তার*

একজন গুরুত্বপূর্ণ কথাসাহিত্যিক জহির রায়হান (১৯৩৩-১৯৭২)। আপাদমস্তক শিল্পী এবং সর্বক্ষণ সৃষ্টির প্রেরণায় নিয়োজিত জহির রায়হান চলচ্চিত্র এবং সাহিত্যে ছিলেন সমান সক্রিয়। সমাজসচেতন এই কথাসাহিত্যিকের রচনার হাতেখড়ি ছোটগল্পের মাধ্যমে। তাঁর প্রথম গল্পগ্রন্থ *সূর্যগ্রহণ* প্রকাশিত হয় ১৯৬২ সালে। নাতিদীর্ঘ সাহিত্যজীবনে এই ঋদ্ধ কথাসাহিত্যিক উপন্যাসের পাশাপাশি রচনা করেছেন সার্থক ছোটগল্প। জহির রায়হানের গল্পগুলোতে মানবজীবনের বিচিত্র বিষয়বস্তুকে সহজবোধ্য এবং প্রাঞ্জলরূপে উপস্থাপন করা হয়েছে। শহরকেন্দ্রিক মধ্যবিত্তজীবনের নানারূপ জটিলতা তাঁর ছোটগল্পে বিধৃত হয়েছে ভিন্নমাত্রিক রূপে। নিখুঁত এবং নিটোল উপস্থাপনায় গল্পগুলোতে বিদ্যমান জনজীবন এবং সমাজ যেন যথাযথ অবয়বে চিত্রিত। বাঙালির জাতীয় জীবনে সংঘটিত প্রায় প্রতিটি আন্দোলন-সংগ্রামে তিনি অংশগ্রহণ করেছেন এবং প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতালব্ধ বিষয়গুলো স্থান লাভ করেছে তাঁর রচিত গল্পে। মানুষ এবং তার চারপাশের পরিবেশই তাঁর গল্পের মুখ্য বিষয়। মধ্যবিত্ত চরিত্রের অন্তর্লোকে আলো ফেলে দূরদর্শী এই লেখক তুলে এনেছেন তাদের আবেগ-অনুভূতি, ব্যক্ত-অব্যক্ত নানা সমস্যা-সংকট, পাওয়া-না-পাওয়ার ইতিবৃত্ত।

সমকালীন নগরজীরনের নানামুখী সংকট উপস্থাপনের পাশাপাশি তাঁর ছোটগল্পে 'গ্রাম, সামন্ত মূল্যবোধের শোষণ, মধ্যবিত্তের সমস্যা, গোপন রাজনীতি, লম্পট, সর্বহারা প্রভৃতি চরিত্র এবং প্রতিবেশ পাওয়া যায়। গল্পের ক্ষেত্রে জহির রায়হান সমাজ সচেতন বস্তুভিত্তিক রচনায় নিবিষ্ট। সমগ্র বিশ্বে যুদ্ধবাজ সাম্রাজ্যবাদী, আধিপত্য বিস্তারে লোলুপ দানব শক্তির বিরুদ্ধে তাঁর লেখনীতে তীব্র প্রতিবাদ উচ্চারিত। উপন্যাসের চাইতে জহিরের ছোটগল্পে ভাবালুতা কম।' (আফজালুল, ১৯৯৩ : ১০০) অন্যায়ের বিরুদ্ধে দীপ্রকণ্ঠ এই সাহিত্যিক মননে-চেতনায় সদা জাগ্রত হয়ে বিভাগোত্তরকালে লেখনী ধারণ করেছেন। 'অগ্রজ শহীদুল্লা কায়সারের সহযোগিতার সূত্র ধরেই জহির রায়হান রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়েন।' (তপন, ১৪১৬ : ৪১) তিনি প্রত্যক্ষ করেছেন, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, তেতাল্লিশের দুর্ভিক্ষ, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, দেশবিভাগ ও এর পরিপ্রেক্ষিতে আলোড়িত মধ্যবিত্ত সমাজের স্বরূপ, তাদের সংকট এবং সংকট উত্তরণের চেষ্টা। এছাড়াও বহুদর্শী জহির রায়হান প্রত্যক্ষ করেছেন কলকাতা এবং ঢাকাকেন্দ্রিক নগরজীবনের নানারকম দুর্ভোগ; ঘাত-প্রতিঘাতে জর্জরিত দ্বিধাগ্রস্ত মানুষ এবং তাদের নানামুখী কর্মকাণ্ড। তিনি পাকিস্তানি সামরিক শাসন ও শোষণ-বঞ্চনার বিরুদ্ধে সরব হয়েছেন, সেসবের রূপ দিয়েছেন চলচ্চিত্রে, কলমে তুলে ধরেছেন নগরকেন্দ্রিক শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সমাজের প্রতিবাদমুখর চিত্র। এই শ্রেণি কখনো শোষণ করছে, তবে বেশির ভাগ সময় শোষিত হচ্ছে, কখনো এরা হয়ে উঠছে

* প্রভাষক, বাংলা বিভাগ, বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়।

বিক্ষোভমুখর, আবার কখনো নিজেদের আর্থ-সামাজিক নিরাপত্তার জন্য পাকিস্তানি সামরিক শাসকের তাঁবেদার। সরল শব্দবিন্যাস, সংক্ষিপ্ত বাক্য কাঠামো ও স্বল্প পরিসরে লেখা জহির রায়হানের গল্পগুলো এভাবে হয়ে উঠেছে প্রাণবন্ত। ভাষা-ব্যবহার এবং আঙ্গিক-বিন্যাসে জহির রায়হান নান্দনিক কথাকার। তাঁর গল্প-আঙ্গিক চিত্রনাট্যধর্মী, কোথাও কোথাও কাব্যধর্মী। সাহিত্য সমালোচক আফজালুল বাসারের মতে,

> চেতনার উৎসারণে এবং আধার পরিচর্যার সতর্কতায় ছোটগল্পের রচয়িতা হিসাবেই জহিরের উজ্জ্বলতা। সম্ভবত উপন্যাস রচনার মত ধৈর্য তার ছিল না। উপন্যাসগুলোর সামগ্রিকতা ও বিস্তৃতির অভাব দেখে মনে হয় জহিরের রচনায় অব্যক্তের অংশ অধিক। কিন্তু ছোটগল্পে তিনি তার রচনার সাধারণ প্রাঞ্জলতা রক্ষা করেও শুরু ও শেষের চমকে, চরিত্রায়নে, অনুভূতির দৃঢ়করণে কিংবা প্লট-গতির সামঞ্জস্য বিধানে চমৎকার কৃতি প্রদর্শন করেছেন। (আফজালুল, ১৯৯৩ : ১৪১)

মধ্যবিত্তের আর্থ-সামাজিক পরিকাঠামো জহির রায়হানের ছোটগল্পগুলোতে গুরুত্ব সহকারে আলোচিত হয়েছে। এই 'মধ্যবিত্ত শ্রেণি বিগত দুই শ বছর ধরে নানা উত্থান-পতন ও বিবর্তনের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হয়েছে। আঠারো শতকের শেষার্ধ এই শ্রেণির উন্মেষের ও আত্মপ্রতিষ্ঠার কাল।' (আবুল কাসেম, ২০১২ : ৮২) কেরানি, ছাত্র, স্বল্প আয়ের চাকরিজীবী, পোস্ট অফিসের পিয়ন, কোম্পানির চাকুরে, ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী কিংবা সমকালীন সরকারের দালালবৃত্তির মাধ্যমে সদ্য ফুলেফেঁপে ওঠা উচ্চমধ্যবিত্ত শ্রেণির মানুষ এবং তাদের নানামাত্রিক জীবনসংকট এসে ভিড় করেছে এই লেখকের হাতে। পরিচিত পরিবেশ-প্রতিবেশ আর সহজ-সরল বর্ণনারীতি সব মিলিয়ে জহির রায়হানের গল্পগুলো পাঠককে আকৃষ্ট করেছে গভীরভাবে। 'নাগরিক মধ্যবিত্তের স্বপ্ন, সংগ্রাম আর হৃদয়রহস্য নিয়ে গড়ে উঠেছে জহির রায়হানের গল্পভুবন। জহির রায়হানের সমাজসচেতন মানসতা এবং বস্তুতান্ত্রিক জীবনার্থের সুস্পষ্ট প্রভাব পড়েছে তাঁর ছোটগল্পে।' (বিশ্বজিৎ, ২০০২ : ১৮৩) বিচিত্র পথগামী মধ্যবিত্ত শ্রেণির মন ও মনন, আচার-আচরণ ও চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য বিধায় এ শ্রেণির অস্তিত্ব কখনোই স্থিতিশীল নয়। কারণ,

> The middle class is a class of people in the middle of a societal hierarchy. In Weberian socio-economic terms, the middle class is the broad group of people in contemporary society who fall socio-economically between the working class and upper class. (http://en.wikipedia.org/wiki/middle_class)

সম্পদ আহরণে বিত্তবান এবং সম্পদ হারিয়ে সর্বহারা শ্রেণিতে পরিণত হতে পারে বলে অনেক সমাজতত্ত্ববিদ মধ্যবিত্তকে একটি শ্রেণি বলে স্বীকার করতে নারাজ। 'মধ্যবিত্তশ্রেণীর চরিত্রে পুঁজিপতিশ্রেণী ও মজুরশ্রেণীর বৈশিষ্ট্যগুলির অদ্ভুত সংমিশ্রণ দেখা যায়।' (বিনয়, ২০০৯ : ৬৪) সামাজিক রাজনৈতিক অর্থনৈতিক সংঘাত-সংঘর্ষ ও উত্থান-পতনে বিচলিত দোদুল্যমান এই শ্রেণি। মধ্যবিত্তের কাছে হতাশাবোধ, দুঃখ-যন্ত্রণাবিলাস অনেক গুরুত্ববহ। নিম্নশ্রেণির মাঝে কোনো হতাশা কাজ করে না, বাঁচার সংগ্রামই তাদের কাছে অনেক বেশি তিক্ত, দুঃখবিলাসের প্রশ্রয় নেই এখানে। কিন্তু মধ্যবিত্তের স্বপ্ন-সম্ভাবনা এবং ক্ষুন্নিবৃত্তির উপকরণের পর্যাপ্ত সংস্থান থাকায় হতাশা ও দুঃখবিলাস তাদের মধ্যে বাসা বাঁধে।

মধ্যবিত্ত শ্রেণি নিজের অবস্থান সম্পর্কে সর্বদা সতর্ক। আর্থিক বিবেচনায় ও সামাজিক শ্রেণিবিন্যাসে সতত মধ্যম পর্যায়ে বিচরণকারী মধ্যবিত্ত সম্পর্কে সমালোচকের বক্তব্য নিম্নরূপ :

> সামাজিক স্তরবিন্যাসে মধ্যবর্তী অবস্থানে বিচরণ করলেও মধ্যবিত্ত শ্রেণির সীমানা নির্ধারণে উল্লেখযোগ্য উপাদান হল পেশা এবং আর্থিক সামর্থ্য। তাদের সম্পদ সীমিত এবং তারা জীবন যাপনের জন্য এমন জীবিকা গ্রহণ করে যা শারীরিক শ্রমসম্পৃক্ত নয়, মানসিক শ্রমসাপেক্ষ। ... মধ্যবিত্ত জনগোষ্ঠী শারীরিক শ্রমবিমুখ, পরশ্রমজীবী। তাই বলে তারা একেবারে শ্রমবিরোধী নয়। তারাও শ্রম দেয় তবে তা কায়িক শ্রম নয়, মানসিক শ্রম। এই অর্থে মধ্যবিত্ত শ্রেণী শ্রমজীবী নয়, পেশাজীবী। (মুস্তাফিজুর, ২০০৯ : ০২)

আর সেকারণেই মধ্যবিত্ত শ্রেণি স্বল্প মেহনত করে এবং নগরমুখী যন্ত্রসভ্যতার যুগে যন্ত্র ভিত্তিক শ্রেণি-পেশা গ্রহণ করে বেড়ে ওঠে। আপাত অর্থে তাদের ধনিক ও মজুর দুই-ই মনে হতে পারে। এরা অন্যসব নিম্নবিত্তের মতো শ্রমজীবী নয়, কিন্তু পরিশ্রম ছাড়াও তাদের নিস্তার নেই। নতুন যন্ত্রপাতির আবিষ্কারসহ সমাজ বিবর্তনের প্রক্রিয়ায় তাদের সংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পায়। বিশেষ করে নগরকেন্দ্রিক যন্ত্রসভ্যতায় সুদখোর মহাজন, নিষ্কর্মা ধনিকশ্রেণি এবং বিত্তহীন দাসশ্রেণির অস্তিত্ব প্রায় লীন হয়ে গেছে। মধ্যবিত্ত শ্রেণির বিকাশ মূলত শহরকেন্দ্রিক। ঢাকা প্রাচীন নগর হলেও ব্রিটিশদের কলকাতাকেন্দ্রিক ঔপনিবেশিক শাসন প্রক্রিয়ার কারণে এই শহর ছিল অবহেলার শিকার। কিন্তু পরবর্তীকালে :

> ব্রিটিশ সরকারের পৃষ্ঠপোষকতার কারণে বিশ শতকের সূচনালগ্ন থেকে (সম্ভবত সময়টি হবে ১৯০৫ সাল, যখন বাংলার প্রথম বিভক্তি ঘটে, তখন চাকরির ক্ষেত্রে পূর্ববঙ্গের মুসলমানদের কিছু সুযোগ-সুবিধা প্রদান কার্যকর করা হয়) একটি শিক্ষিত মুসলিম মধ্যবিত্ত শ্রেণী গঠিত হচ্ছিল, যা দেশের সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক জীবনে নেতৃত্ব দান করে। সামাজিকভাবে বলা যায়, ব্রিটিশদের মাধ্যমে সৃষ্ট নব্য শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীটি দেশের রাজনৈতিক জীবনে একটি অত্যন্ত শক্তিশালী শ্রেণী হয়ে ওঠে... (নাজমুল, ২০০৮ : ৯৯)

বঙ্গভঙ্গের পর থেকে শিক্ষিত মুসলিম সমাজের সচেতনতা ও ইংরেজ শাসকদের সুদৃষ্টির ফলে তারা পুনর্জীবিত হয়ে ওঠে। 'বাঙালী শিক্ষিত মধ্যবিত্তের মধ্যে কেরানীদের সংখ্যাধিক্য ইংরেজি আমলের গোড়া থেকেই দেখা যায় এবং বাঙালী মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সে-বৈশিষ্ট্য আজও অনেকটা অক্ষুণ্ন আছে।' (বিনয়, ২০০৯ : ৬৮) আবার দেশবিভাগের পর ঢাকা প্রাদেশিক রাজধানী হলে, মফস্বল শহর থেকে মেট্রোপলিটন নগরে পরিবর্তিত হতে থাকে। নাগরিক সুযোগ-সুবিধার ক্রমবৃদ্ধির ফলে গ্রাম থেকে আগত মানুষ এবং উঠতি নগরের মধ্যস্বত্বভোগীর সমন্বয়ে গড়ে ওঠে ঢাকাকেন্দ্রিক নাগরিক মধ্যবিত্তসমাজ। আপসহীন মধ্যবিত্তের স্বাধিকারচেতনা এবং লেজুড়বৃত্তির মাধ্যমে দ্রুত উন্নতির চিন্তা — এই দ্বিমুখী মানসিকতার স্বাক্ষরবাহী মধ্যবিত্তশ্রেণি সামাজিক-রাজনৈতিকভাবে সচল করে তুলেছিল নাগরিক জীবনের চাকা। 'উল্লেখযোগ্য যে উনিশ শতক থেকে পাকিস্তান আমলের শেষভাগ পর্যন্ত (১৯৭০) বাঙালী মধ্যবিত্তের স্বাধীন স্বদেশ ও জাতীয় মুক্তি-অন্বেষা মূলতঃ তিন ধরনের ভাবধারা অনুপ্রাণিত— এক, জাতীয়তাবাদী; দুই, স্বতন্ত্রবাদী; তিন, সমাজতান্ত্রিক।' (ইদ্‌রিস, ১৯৮৫ : ৩৭) পাকিস্তান আমলে জাতীয়তাবাদী ভাবধারায় বাঙালির ভিতরকার স্বাধিকার আন্দোলন

সুতীব্র হয়ে ওঠে। গ্রাম থেকে আসা কিংবা নগরকেন্দ্রিক নব্য শিক্ষিত মধ্যবিত্তরাই নিজেদের অধিকার আদায়ের লক্ষ্যে বারবার নানামাত্রিক সংগ্রামে লিপ্ত হয়েছে আবার স্বতন্ত্রবাদী ধারার মধ্যবিত্ত নগরকেন্দ্রিক জীবনে নিজেদের টিকিয়ে রাখতেই ব্যস্ত থেকেছে। আত্মলব্ধ অভিজ্ঞতার আলোকে জহির রায়হান মধ্যবিত্তের জীবনাচারের এই বিষয়গুলোর নিখুঁত বিবরণ হাজির করেছেন তাঁর গল্প এবং উপন্যাসে।

মধ্যবর্তী স্তরে অবস্থানকারী নাগরিক মধ্যবিত্তদের সুললিত এবং সুলিখিত বিবরণ জহির রায়হানের 'সোনার হরিণ' গল্পটি। স্বল্প আয়ের শহুরে চাকুরিজীবীর সাধ এবং সাধ্যের মাঝে সমন্বয় ঘটানোতে সৃষ্ট জটিলতার কাহিনিই আলোচ্য গল্পের মূল উপজীব্য। ত্রিশোর্ধ্ব বয়সের এক সরকারি চাকুরিজীবী তার সদ্য বিবাহিতা স্ত্রীকে নিয়ে নতুন সংসার সাজানোর জন্য আসবাবপত্র কিনতে আসে। বড়, অভিজাত এবং সুবিন্যাস্ত দোকানের প্রায় প্রতিটি সামগ্রী নবদম্পতিকে আকৃষ্ট করে। সংসার সাজাতে তাদের বেশকিছু আসবাবপত্রের প্রয়োজন হলেও দাম শুনে — 'মুহূর্তে মেয়েটির মুখের হাসি মিলিয়ে গেল। ভ্রূজোড়া কপালে তুলে সে মৃদুস্বরে বলল, এত টাকা।' (জহির, ২০১৩ : ৪৮০) চাকুরির সামান্য বেতনে সংসার চালানোর পর অবশিষ্ট আয় দিয়ে শখ পূরণের সাধ্য থাকে না তাদের। ফলে বহুদিনের লালিত আরাম কেদারার স্বপ্নটি থেকে যায় অপূর্ণ। আসবাবপত্রের জন্য দোকানি কিছু অগ্রিম টাকা প্রদানের প্রসঙ্গ তুললে পরের দিন আসার প্রতিশ্রুতি দিলেও এই দম্পতির পরের দিন কেন, পরের বছরেও আর ফিরে আসা হয় না। হয়ত আর্থিক টানাপড়েনে আবর্তিত এই পরিবার ফার্নিচার কেনার মতো টাকা সঞ্চয় করতে পারে নি। তথাপিও আলোচ্য ব্যক্তি শেষপর্যন্ত হাল ছেড়ে দেয় না, নিরন্তর সে বিভিন্ন দোকানে যায় এবং বাঞ্ছিত পণ্যগুলো দেখে এবং নিজের কেনার অক্ষমতার দরুণ ফিরে আসে। মূলত 'মধ্যবিত্তের চোখ থাকে উপরের দিকে, সে উঠতে চায় কিন্তু পা থাকে মাটিতে গাঁথা।' (হাসান, ২০১২ : ৬৫) আর সে কারণেই দোকানের সেই আসবাবপত্রগুলো কোনোদিনই তাদের ঘর আলো করে আসে না, সেগুলো থেকে যায় মরীচিকার মতো কাছে থেকেও দূরে এবং সোনার হরিণের ন্যায় নাগালের বাইরে। স্বল্প আয়ের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবোধসম্পন্ন এই মধ্যবিত্ত কেরানি হয়ে ওঠে সিসিফাস সদৃশ। প্রতিনিয়ত স্বপ্নগুলোকে কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য অভিমুখে ঠেলে নেয় কিন্তু স্বপ্নপূরণের পূর্বেই তা পুনরায় ব্যর্থতার অভিমুখে গড়িয়ে পড়ে। কিন্তু পারিপার্শ্বিক পরিস্থিতি এবং মধ্যবিত্তের স্বপ্নবিলাসী মনের কারণে সে কখনো থেমে থাকতে পারে না। সিসিফাসের ন্যায় তাকে প্রতিনিয়ত লড়াইয়ে অবতীর্ণ হতে হয়; সাধ এবং সাধ্যের সমন্বয়ে বারংবার হতে হয় ব্যর্থ। গল্পকথকের সাথে উক্ত ব্যক্তির পরে দেখা না হলে মধ্যবিত্ত জীবনের না পাওয়ার এই ইতিহাস অনাবিষ্কৃত থেকে যেত। দশ বছর পর গল্পকথক দেখতে পায় লোকটির বয়স বেড়েছে কিন্তু অবস্থার তেমন কোনো উন্নতি হয় নি; কারণ তখনও সে ফার্নিচারের দোকানে প্রলাপের মতো বলছে —

> আমাদের অনেকগুলো ফার্নিচার দরকার, বুঝলেন? মানে, পুরো একটা ঘর সাজাতে যা লাগে। যেমন ধরুন, একটা সুন্দর ড্রেসিংটেবিল, একখানা মজবুত খাট — তা ছাড়া বুঝলেন কি না, একটা আরাম-কেদারার বড় শখ আমার। কী সুন্দর হাত-পা ছড়িয়ে বসা যায়, তাই না? (জহির, ২০১৩ : ৪৮০)

জহির রায়হানের 'সোনার হরিণ' গল্পটি মধ্যবিত্ত জীবন রূপায়ণের বস্তুনিষ্ঠ দলিল। লালিত স্বপ্ন এবং কঠিন বাস্তবতার মধ্যকার চিরকালীন দ্বন্দ্বে বিপর্যস্ত এক কেরানির করুণ কাহিনি নিয়ে রচিত হয়েছে গল্পটি। মধ্যবিত্ত সমাজ নিয়ে এরূপ সুন্দর-সার্থক ও প্রাণস্পর্শী গল্প বাংলা সাহিত্যে খুব বেশি লেখা হয়নি।

সমালোচকের যথার্থ উক্তি : 'বিকাশমান বাঙালি মধ্যবিত্তের দ্বন্দ্ব-জটিল, বিবর্ণ অবস্থা এবং সীমিত-আয়ের কেরানির স্বপ্নময় জীবন কল্পনা ও ভবিষ্যৎ ভাবনার স্বরূপ উন্মোচিত হয়েছে জহির রায়হানের সাহিত্যে।' (রফিকউল্লাহ, ১৯৯৭ : ১৬০)

নাগরিক মধ্যবিত্তের জীবনবাস্তবতার করুণ ইতিহাস সংবলিত গল্প 'হারানো বলয়'। 'সোনার হরিণ' গল্পে নব দম্পতি ঘর সাজাতে আসবাব কিনতে ব্যর্থ হয়েছে কিন্তু 'হারানো বলয়'-এ আলম-আরজু সংসারিক অভাব-অনটনে সংসার বাঁধতে পর্যন্ত পারছে না। কলেজে একসাথে পড়ার সময় প্রণয়াবদ্ধ থাকলেও মধ্যবিত্তের চিরচেনা সংকটের দরুণ তারা দুজন দু-দিকে ছিটকে পড়েছে। প্রবল ইচ্ছা সত্ত্বেও তাদের একই বলয়ে আবদ্ধ থাকা সম্ভব হয় নি। কেরানি আলম হয়ে ওঠে হরিপদ কেরানির অনুরূপ : 'ঘরেতে এল না সে তো, মনে তার নিত্য আসা-যাওয়া—', (রবীন্দ্রনাথ, ১৩৫০ : ৬১৪) আরজুকে ঘিরে তার মনে স্বপ্ন-আশা নিত্য ঘুরপাক খায়। বড় ভাই মুনীর এবং সংসারের অন্য সবাই নিয়ত তাকে মনে করিয়ে দিয়েছে, আরজু মধ্যবিত্ত পরিবারের মেয়ে, ভালোবাসার রঙিন স্বপ্ন দেখা তাকে মানায় না। পরিবারে বৃদ্ধা মা এবং ছোট ভাই-বোনদের দায়িত্ব নিতে গিয়ে তাকে ব্যক্তিগত জীবনের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বিসর্জন দিতে হয়েছে। তথাপিও পরিবারের অর্থনৈতিক নিরাপত্তার প্রসঙ্গ থেকে গেছে অনিশ্চিত। আর এই ব্যর্থতার বিবরণ পাওয়া যায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'হঠাৎ দেখা' কবিতার মতো যখন আকস্মিকভাবে আলম আর আরজুর দেখা হয়ে যায়। দীর্ঘদিন পর দুজনের সাক্ষাৎ ও পরস্পরের কথা থেকে দুই পরিবারের অসহায়তার চিত্র স্পষ্ট হয়ে ওঠে। 'মহানাগরিক জীবনের শ্রেষ্ঠ প্রতীক হল টাকা। টাকা সচল তাই মানুষও সচল। এমনকি মানবহৃদয়ের যে সমস্ত আবেগ অনুভূতি ভাবানুভাব ও সহজবৃত্তিকে আমরা এতদিন শাশ্বত সত্য বলে জানতাম সেগুলিও আজ টাকার চাকচিক্যের কাছে ম্লান হয়ে গেছে।' (বিনয়, ১৯৭৩ : ০১) আর এই টাকার অভাবে ছোটবোন আসকারিকে বাঁচাতে পারে নি আরজু। কোম্পানি অফিসের সামান্য কেরানি আলম, আরজুর সংসারের এই দৈন্যদশার কথা জানলেও কোনোপ্রকার সাহায্য করতে পারে না। কারণ বেতনের সামান্য টাকা দিয়ে নিজের সংসার চালাতে গিয়ে হিমশিম খায় আলম। টাকার অভাবে মাসের শেষদিকে মেসে ডায়েট বন্ধ হয়ে যায় তার। আরজুর পরিবারের একমাত্র উপার্জনক্ষম মুনীর ভাই নিরাপত্তা বন্দি হিসেবে জেলে গেলে পুরো পরিবার নিয়ে ঘোর সংকটে পতিত হয় আরজু। অন্যদিকে আলমের মুখের দিকেও চেয়ে আছে গ্রামে বসবাসকারী তার পুরো পরিবার। যোগানের তুলনায় চাহিদার পরিমাণ খুব বেশি তাই বেতনের 'টাকা হাতে নিয়েও বেশ ঘামিয়ে উঠেছে সে। অন্ধকার — চারিদিকে যেন অন্ধকার।' (জহির, ২০১৩ : ৪৯৭) সংসারের সচ্ছলতা আনয়নের জন্য ওরা দুজনই অনেক বেশি ত্যাগ শিকার করে। আরজু পরিবারের আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্য নিশ্চিত করতে গিয়ে বালার বদলে হাতকড়া পড়ে শেষপর্যন্ত। জীবনের ঘূর্ণাবর্তে অনেককিছুর পরিবর্তন সাধিত

হলেও রূপান্তর ঘটে না ত্রিশঙ্কু অবস্থায় পড়ে-থাকা এই মধ্যবিত্ত শ্রেণিটির। মধ্যবিত্ত বলয়ের মধ্যে প্রতিনিয়ত ঘূর্ণায়মান এই শ্রেণি। নিজের দুঃখকে আড়াল করে রাখা এবং নিজের সমস্যা সমাধানে অন্যের দ্বারস্থ না-হওয়া তাদের শ্রেণিগত বৈশিষ্ট্য।

নিজের দৈন্য এবং হীনতাকে আড়াল করে উচ্চবিত্তদের সাথে সামঞ্জস্য রক্ষা করে চলার জন্য উদয়াস্ত পরিশ্রম করে চলেছে 'ভাঙাচোরা' গল্পের টুনু এবং তার স্বামী। 'দেশবিভাগের পর ঢাকা পূর্ব-পাকিস্তানের রাজধানী হলে এদেশে অবকাঠামোগত উন্নয়ন পরিলক্ষিত হতে থাকে।' (মনসুর, ১৩৮১ : ৮) আর মফস্বল শহরেও উন্নয়নের কিছুটা ছোঁয়াচ লাগে। রাজধানীতে বসবাসকারী সালাম সাহেব অফিসের কাজে মফস্বল শহরে যায় এবং কাজ সমাপনান্তে গিয়ে হাজির হয় কৈশোরের খেলার সাথী টুনুর বাড়িতে। কলকাতায় টুনু ও সালাম পড়াশুনা করত একই স্কুলে। টুনুর সাথে দেখা হলে সালাম দেখতে পায় আট বছরে টুনুর মধ্যে এসেছে অনেক পরিবর্তন। সালাম টুনুর পরিবর্তনে কিছুটা অবাক হয় কিন্তু টুনুর স্বামীকে দেখে সালাম বিস্মিত না হয়ে পারে না। কারণ স্টেশন থেকে সালাম সাহেব বাংলোতে পৌঁছেছিল টুনুর স্বামীর রিকসায়। দেড়শ টাকা বেতনের পোস্ট অফিসের সামান্য কর্মচারীর কাজ করে চারটি ছেলে-মেয়ে নিয়ে সংসার চালানো সম্ভব নয় বলে অফিসের কাজের শেষে তিনি রিকসা নিয়ে বেরিয়ে পড়েন রাস্তায়। টুনুর কাছে এ খবর অজানা তথাপিও স্বামীর কাছ থেকে সংসারের ভার লাঘব করার জন্য সে পার্শ্ববর্তী মেসে রান্নার কাজ নিয়েছে। সালামের কাছ থেকে টুনু সংসারের এই ভাঙাচোরা চিত্র গোপন করতে চায়। শুধু সালামের কাছে কেন টুনু এবং তার স্বামী দুজনেই সংসারের ভাঙাচোরা চিত্রটি পরস্পরের কাছ থেকেও আড়াল করবার ব্যর্থ চেষ্টা করে সবসময়। যতদূর সম্ভব এই দম্পতি সুখে থাকার ভান করে পরস্পরের কাছে, অন্যদের কাছে তো বটেই। টুনু ভাবে মেসে কাজের কথা শুনলে স্বামী কষ্ট পাবে আর সে বেচারা ভাবে রিকসা চালানোর খবর টুনু সহ্য করতে পারবে না। সংসারে সুখ আনয়নে দুজনেই মুখ বুজে কষ্ট স্বীকার করে যাচ্ছে নীরবে নিভৃতে। অন্তরাল থেকে নিবেদিতপ্রাণ কিন্তু প্রকাশ করতেই যত বাধা তাদের। কারণ —

> ও চলে গেলে কানের কাছে মুখ এনে চাপা গলায় টুনু বলল, পিয়নের কাজ করলে কী হবে। লোকটির প্রেসটিজ জ্ঞান বড় টনটনে। খবরদার। আমি যে মেসের ভাত পাক করে দিই, ঘুণাক্ষরেও এ কথাটা বলো না ওকে। তাহলে রেগে আগুন হয়ে যাবে। টুনুর কণ্ঠে অনুরোধের সুর। (জহির, ২০১৩ : ৫২৫)

আবার সালামের প্রতি টুনুর স্বামীর অনুরোধ —

> একখানা ছেঁড়া গামছায় মুখ মুছতে মুছতে কাছে এগিয়ে এসে হঠাৎ সে বলল, মাসে পঞ্চাশ টাকা বেতনে সংসার চলে না। তাতো বোঝেনই। অফিস ছুটির পর অগত্যা তাই রাতে রিকশা চালাই। ... দোহাই আপনার সালাম সাহেব। ও কথাটা বলবেন না টুনুকে। প্রেসটিজ জ্ঞান বড় টনটনে ওর। জানতে পারলে কেলেঙ্কারি কিছু একটা ঘটিয়ে বসবে। দোহাই আপনার —। (জহির, ২০১৩ : ৫২৫)

অন্যের মুখাপেক্ষি হতে চায় না জহির রায়হানের 'দেমাক' গল্পের গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র রহিম শেখ। মধ্যবিত্ত এই লোকটি নিজের হালাল উপার্জন দ্বারা সংসার পরিচালনা করে এবং

নিজের মতো করে চলে। প্রাচুর্য না থাকলেও অল্প আয়ের সংসারে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের কোনো অভাব ছিল না তার। নিজের মতো চলার এই প্রচেষ্টাকে হস্তবিদ্যাবিশারদ রহমত এবং তার স্ত্রী দেমাক বলে আখ্যায়িত করে। তারা স্বামী-স্ত্রী মিলে রহিম শেখকে নিয়ে সমালোচনা করলেও রহিম কখনো অন্যের বিষয়ে নাক গলানো পছন্দ করে না। রহিম শেখ নিজের উপার্জন নিয়ে গর্ব অনুভব করে। তবে —

> টাকা যে খুব পায় তা নয়। তবু সে অল্প কটা টাকা কাপড়ের ব্যাগে পুরে যখন সে বাসায় ফেরে, তখন এক অদ্ভুত তৃপ্তিতে মন-প্রাণ ভরে থাকে রহিম শেখের। কাজ তার গর্ব। কাজ করেই খায় সে। পরের কাছে হাত পাতে না। অন্যের মুখাপেক্ষী হয়ে থাকে না। (জহির, ২০১৩ : ৫৬৯)

নিয়তির নিষ্ঠুরতায় পড়ে রহিম শেখ চোখ দুটো হারায়। পাঁচ সন্তান এবং স্ত্রীকে নিয়ে খুব অসহায় হয়ে পড়ে সে তবুও কারো কাছে মাথা নত করে নি, চায় নি কারো অনুগ্রহ-অনুকম্পা। রহমত শেখ ধারণা করেছিল রহিম হয়ত ভিক্ষাবৃত্তির পথ বেছে নিয়েছে। কিন্তু আত্মমর্যাদাবোধ সচেতন রহিম শেখ কারো দয়ার উপর যেমন নির্ভর করেনি তেমনি রহমতের মতো লোক ঠকানো ব্যবসাও ফেঁদে বসে নি। কষ্টসাধ্য হলেও জীবিকার্জনে সে সম্মানজনক স্বাধীন কাজে নিজেকে নিয়োজিত করেছে।

গ্রামীণ জনপদের মানুষ শিক্ষা, চিকিৎসা, চাকুরি, ব্যবসাসহ নানা প্রয়োজনে শহরমুখী হয়। বিচিত্র মানুষের আগমনে মুখর শহরে এসময় ব্যাপক পরিবর্তন ঘটতে থাকে। প্রাদেশিক রাজধানী ঢাকায় রাস্তা-ঘাট, অফিস-আদালত, স্কুল-কলেজ, শিল্প-কারখানা ইত্যাদি গড়ে উঠতে থাকে। ফলে ষাটের দশকের প্রথমার্ধের মধ্যে ঢাকাকেন্দ্রিক একটি শিক্ষিত নাগরিক মধ্যবিত্ত ও নিম্ন মধ্যবিত্ত শ্রেণি বিকশিত হয়। এ শ্রেণি ভাষা-আন্দোলন থেকে শুরু করে মুক্তিযুদ্ধ পর্যন্ত এদেশের রাজনীতি-অর্থনীতিসহ সাহিত্য-শিল্প-সংস্কৃতির ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। (সরওয়ার, ১৪১২ : ৩)

সেক্রেটারিয়েটের এলডি ক্লার্ক, দৈনিক 'দেশের কথা' অফিসে কাজ করে তারপরও সংসারের চাকা ঘুরতে চায় না 'জন্মান্তর' গল্পের হ্যাংলা রোগাটে লোকটার। মধ্যবিত্ত কেরানি এই ব্যক্তির সংসারের অচলাবস্থার বিবরণ উঠে এসেছে শহুরে এক পকেটমারের বর্ণনা থেকে। পকেটমার মন্তুর সাথে প্রায়ই এই লোকটির দেখা হলেও দুজনের পরিচয় হয় নি এবং হবার কথাও নয়। কিন্তু প্রবল বর্ষণস্নাত একরাতে নিওমোনিয়া থেকে নিজেকে রক্ষাকল্পে লোকটি আশ্রয় নেয় মন্তুর ছাতার নিচে। মধ্যবিত্ত সব সময় নিজেকে বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টা করে সকল ঝক্কি-ঝামেলা থেকে। সারাদিন পরিশ্রম করেও এই শ্রেণি মধ্যবিত্ত জীবনধারা থেকে বের হয়ে আসতে পারে না শেষপর্যন্ত। কারণ তারা ঝুঁকি নিতে ভয় পায় এবং মাঝারি মানের জীবনযাত্রাতেই সন্তুষ্ট থাকে। বাইরে থেকে মধ্যবিত্তের প্রকৃত অবস্থা জানা তো দূরের কথা ধারণা পর্যন্ত করা যায় না। এই হেতু দুই অফিসে পনেরো ঘণ্টা কাজের কথা শুনে মন্তু লোকটির অর্থনৈতিক অবস্থা সম্পর্কে যে ধারণা করেছিল তার বিপরীত চিত্র দেখতে পায় তার বাসায় গিয়ে। শেষপর্যন্ত ভদ্রলোকের বক্তব্য থেকে সংসারের টানাপড়েনের চিত্রটি সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে —

পরিবারটা তো আর নেহায়েত ছোট নয়, ভাইবোন সবাই মিলে মোট বারো জন। তা — দেড়শ টাকায় কিই বা হয়। মাত্র দেড়শ টাকা! চোখ দুটো কপালে উঠল মন্তুর। একটা লোক দিনে পনের ঘন্টা কাজ করে মাসের শেষে পায় মাত্র দেড়শ টাকা! (জহির, ২০১৩ : ৫৫১)

কেরানি এই ভদ্রলোকের আয়ের উপর নির্ভরশীল পুরো পরিবার, আর তাই তার পকেট থেকে উপার্জনের একশ টাকা হারানোর ঘটনায় সবাই আহাজারি করে ওঠে। পরিবারটির অসহায়তার চিত্র পর্যবেক্ষণে মন্তু তার বহুকাঙ্ক্ষিত স্বর্ণের আংটি রাতের আঁধারে লোকটির পকেটে ফেলে দিয়ে চলে যায়। মন্তু জানে শতকষ্ট হলেও কেরানি এই পরিবারটি তার সাহায্য গ্রহণ করবে না, আত্মসম্মান বিসর্জন দিয়ে। তাই সবার অজ্ঞাতসারেই কাজটি করে মন্তু।

বাংলাদেশে মধ্যবিত্ত শ্রেণি জন্মলাভ করেছে ইংরেজদের প্রত্যক্ষ পৃষ্ঠপোষকতা ও তত্ত্বাবধানে। এই শাসক শ্রেণি আপন স্বার্থসিদ্ধির প্রেরণায় সৃষ্টি করে নতুন একটি জনবল। সরকারি স্বার্থরক্ষা এবং আপন ভবিষ্যৎ নির্মাণই ছিল এই জনগোষ্ঠীর প্রধান লক্ষ্য। তারা ছিল উৎপাদন সম্পৃক্তিহীন বিচিত্র পেশাজীবী মানুষ। আর ইংরেজশক্তি এদেশে তাদের শোষণের ভিত পাকাপোক্ত করার উদ্দেশ্যে একটি শিক্ষানীতি প্রবর্তন করে যেটি লর্ড মেকলের শিক্ষানীতি হিসেবে সর্বাপেক্ষা বেশি পরিচিত। এই শিক্ষানীতির অভিপ্রায় ছিল :

বর্তমানে আমাদের এমন একটি শ্রেণী গড়ে তুলতে হবে যারা আমাদের ও যাদেরকে আমরা শাসন করি তাদের মধ্যে দোভাষীর কাজ করবে। যারা মাংসের গড়নে ও দেহের রঙে ভারতীয় হবে বটে, কিন্তু রুচি, মতামত, নীতিবোধ ও বুদ্ধির দিক দিয়ে হবে খাঁটি ইংরেজ। (টমাস, ২০০৭ : ৭৪)

ঔপনিবেশিক শাসনামলে শিক্ষা-বিস্তারের অভীষ্ট ছিল অনুগত এক শ্রেণির সৃষ্টি যারা ইংরেজ শাসনের গুণকীর্তন করবে এবং তাদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠায় নিয়োজিত থাকবে। আর এই অনুগত, আজ্ঞাবাহী এবং প্রভুভক্ত শ্রেণি তৈরির লক্ষ্যে সৃষ্ট মেকলের শিক্ষানীতির ফল 'পোস্টার' গল্পের আমজাদ সাহেব। দেশে যখন চাকরি থেকে ছাঁটাইসহ সরকারের বিভিন্ন কর্মকাণ্ড নিয়ে সমালোচনা এবং আন্দোলনের ঝড় বয়ে যাচ্ছে তখন আমজাদ সাহেব সরকারের প্রশংসায় পঞ্চমুখ। সরকার তথা উর্ধ্বতন মহলের সকল কর্মকাণ্ডেই সে অবনত মস্তকে সমর্থন দেয়। বিপ্লবী তরুণ যারা সরকারের এই অন্যায়ের বিরুদ্ধাচরণ করে তাদের বিষয়ে আফজাল সাহেব এবং আমজাদ সাহেবের মধ্যকার কথোপকথনে শেষোক্ত জনের অবস্থান সুস্পষ্ট হয় —

আফজাল সাহেব বললেন। দেশের মধ্যে সাচ্চা কেউ যদি থেকে থাকে তো ওরাই আছে। ওরাই লড়ছে দেশের স্বার্থের জন্য।
আর মন্ত্রীরা বুঝি কিছু করছে না আপনি বলতে চান?
করছে না কে বলেছে। আলবত করছে। আফজাল সাহেব উত্তর করলেন। খবরের কাগজে দেখেন না। আজ এখানে টিপার্টি, কাল ওখানে ডিনারের আয়োজন। পরশু নিউ ইয়র্ক যাত্রা। করছে না কে বলছে। অনেক করছে ওরা।
তা তো বলবেনই। একচোখা লোক কি না, তাই একদিকটাই দেখেন শুধু। (জহির, ২০১৩ : ৫৫৪-৫৫৫)

কিন্তু আত্মকেন্দ্রিক আমজাদ সাহেবের উপর যখন নেমে এল ছাঁটাইয়ের খড়্গাঘাত তখন বিষয়টির মর্মোপলব্ধি করলেন তিনি। পোস্টারের লেখাগুলো শেষপর্যন্ত তার স্বার্থ এবং জনস্বার্থকে একাত্ম করতে সক্ষম হয়। পোস্টারের ভিতরে বেজে ওঠে চাকরিচ্যুত আমজাদ সাহেবের ক্ষুব্ধমনের প্রতিধ্বনি। তাই পোস্টার এবং পোস্টারের ভাষা আজ তার কাছে যৌক্তিক হয়ে ওঠে। তার অপছন্দ রূপান্তরিত হয় পছন্দে, অসুবিধা পরিণত হয় সুবিধায়। স্বার্থপ্রণোদিত আমজাদ সাহেব আন্দোলনের সাথে বোধ করেন একাত্মতা। বাসার পরিচ্ছন্ন দেয়ালে লাগানো পোস্টারটি তাই আজ তার বিরক্তি বা রাগের উদ্রেক না করে মনোযোগ আকর্ষণ করে। 'হঠাৎ পোস্টারের দিকে নজর পড়তেই থমকে দাঁড়ালেন তিনি। পুরনো খবরের কাগজের ওপর লাল কালিতে লেখা গোটা গোটা অক্ষর। ছাঁটাই করা চলবে না।' (জহির, ২০১৩ : ৫৫৯)

জহির রায়হান অর্থনির্ভর নাগরিক মধ্যবিত্তের সামাজিক, রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক বিষয় পাঠককে অবহিত করেছেন সবিস্তারে। এই শ্রেণির প্রত্যেক পরিবারেই রয়েছে নানা সমস্যা ও সংকট, আর এ থেকে পরিত্রাণের চেষ্টা। তা সত্ত্বেও নাগরিক মধ্যবিত্তের উত্তরণ ঘটে না বিপাক-বিপত্তিপূর্ণ পরিস্থিতি থেকে। ঝুঁকি নিতে বীতস্পৃহ মধ্যবিত্ত শ্রেণি কৃচ্ছ্রসাধন করে হলেও নির্বিঘ্ন-নিষ্কণ্টক থাকতে চায় সর্বত্র। তাদের এই মানসিকতার জন্য দায়ী ইংরেজদের কেরানি বানানোর শিক্ষা। কারণ —

> চাকরি এদের গলায় দাঁড়াশ সাপের মত ল্যাজ পেঁচিয়ে দেয়, রসের আকারে ছেড়ে দেয় স্লো পয়জন, যার প্রভাবে তারা মরে যায় না, পাগলও হয় না, কেবল জীর্ণ হতে থাকে। সঙ্গে সঙ্গে তাদের মানসিক তেজ দ্বিধাবিভক্ত হয়ে যে দিকটা জাতিকে জাগাবার জন্য, নিজেদের জাগবার জন্য প্রয়োজন সেটা মরে যায়। (অদ্বৈত, ২০০০ : ৬৫০)

আন্দোলন-সংগ্রাম থেকে নিরাপদ দূরত্ব বজায় রাখার কলঙ্ক যেমন মধ্যবিত্তের আছে তেমনি আছে বিভিন্ন আন্দোলন সংগ্রামে বীরত্বপূর্ণ অংশগ্রহণের গৌরবদীপ্ত ইতিহাস। মধ্যবিত্তের অংশগ্রহণ ছাড়া এদেশে কোনো বড় আন্দোলন সফলতা লাভ করতে পারে নি। কারণ দেশের মোট জনগোষ্ঠীর একটি বৃহত্তর এবং গুরুত্বপূর্ণ অংশ মধ্যবিত্ত। জাতীয় জীবনে বিভিন্ন দাবি আদায়ে শ্রম এবং মেধা দিয়ে মধ্যবিত্ত শ্রেণি অংশগ্রহণ করেছিল।

> জহির রায়হানও নিপীড়িত মানুষের বিশ্বাস-সংস্কারে সংগ্রাম আর সচেতনতার আলো সঞ্চার করেছেন। ষাটের দশকে যখন আমাদের অধিকাংশ ঔপন্যাসিক — কখনো ভয়ের কাছে নতি স্বীকার করে, আবার কখনো বা জাগতিক মোহের কাছে — ভুলে গেলেন সমাজসত্য আর যুগ-সংক্ষোভ, তখন সমাজ-সতর্ক এবং রাজনীতি-সচেতন জহির রায়হান ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে লেখনী ধরেছেন, হয়ে-উঠেছেন একজন দায়িত্বান নির্ভীক শিল্পী। (বিশ্বজিৎ, ১৯৯১ : ২৮-২৯)

এদেশীয় আর্থ-সামাজিক কাঠামো ধ্বংসের লক্ষ্যে পাকিস্তানি সামরিক শাসকদের ধর্মের অজুহাতে অন্যায়ভাবে চাপিয়ে দেয়া ভাষা, শিক্ষা ও সংস্কৃতির বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে উঠেছেন শিক্ষিত মধ্যবিত্ত নাগরিক সমাজ, 'একুশের গল্প', 'সূর্যগ্রহণ', 'মহামৃত্যু', 'সময়ের প্রয়োজনে', 'কয়েকটি সংলাপ' প্রভৃতি গল্প এর উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। 'সূর্যগ্রহণ' গল্পে তসলীম

চাকরিসূত্রে শহরে আসে। সংসারের একমাত্র উপার্জনক্ষম তসলীমের দিকে তাকিয়ে থাকে গ্রামে তার পুরো পরিবার। বাড়িতে তার নব পরিণিতা স্ত্রী, বিবাহযোগ্যা ছোটবোন মিনু এবং অসুস্থ বৃদ্ধা মা চেয়ে আছে তার মুখপানে। কিন্তু পাকিস্তানি স্বৈরশাসকরা মাতৃভাষার উপর আঘাত হানলে শিক্ষিত-সচেতন তসলীম ঘরে বসে থাকতে পারে নি। আনোয়ার সাহেব বারবার বোঝানোর চেষ্টা করলেও রুখতে পারে নি তাকে। 'সে কথা শুনেও আমল দেয়নি তসলীম। বলেছে, আগে ভাষাকে বাঁচাতে হবে।' (জহির, ২০১৩ : ৫০৯) মাতৃভাষা রক্ষার জন্য তসলীম প্রাণ দিয়েছে। আর তার অসহায় পরিবার সম্মুখীন হয়েছে বহুবিধ সংকটের। শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণি চাকুরির প্রত্যাশায় শিকড় ছেড়ে অর্থাৎ গ্রাম ছেড়ে শহরমুখী হয়। নাগরিক জীবনের মোহ তাদের শহরের প্রতি আকৃষ্ট করে আবার গ্রামের প্রতিও থাকে তাদের নিবিড় টান। দ্বিমুখী সংকটে সদা পতিত মধ্যবিত্ত শ্রেণি। 'মহামৃত্যু' গল্পের কলেজ পড়ুয়া ছেলেটি শহরে এসেছিল উচ্চশিক্ষা গ্রহণের জন্য কিন্তু মাতৃভাষা রক্ষার্থে সে নিজের জীবন উৎসর্গ করেছে। মধ্যবিত্ত পরিবারের ছেলে তপু গ্রাম থেকে শহরে এসেছে মেডিকেল কলেজে পড়ার উদ্দেশ্যে। স্বাপ্নিক তপুর জীবন নিয়ে ছিল হাজারো পরিকল্পনা। লেখাপড়া শেষ করে গ্রামে ফিরে যেতে চেয়েছিল তপু। কিন্তু গ্রামের প্রতি দায়বদ্ধ হলেও শেষপর্যন্ত মাতৃভাষার উপর আঘাত সে সহ্য করতে পারেনি। প্রতিবাদে মুখরিত হয়ে উঠে তপু। তপুর স্ত্রী রেণু বহু চেষ্টা করেও তাকে ফেরাতে পারে নি। জহির রায়হান তাঁর নিজ জীবনের অভিজ্ঞতার আলোকে মধ্যবিত্তের প্রত্যয়ান্বিত জীবনচিত্র অঙ্কন করেছেন। আন্দোলন-সংগ্রামে আত্মপ্রত্যয়ী এই সাহিত্যিকের ভূমিকা ছিল অগ্রণী। জহির রায়হান ঢাকার জগন্নাথ কলেজের ছাত্রাবস্থায় প্রত্যক্ষভাবে ভাষা আন্দোলনে যোগ দেন এবং ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি কারারুদ্ধ হন। (তপন, ১৪১৬ : ৪১) তিনি দেখিয়েছেন, সৌম্য-শান্ত মূর্তি মধ্যবিত্ত শ্রেণিও দেশের মাটি ও মাতৃভাষার প্রতি দায়বদ্ধ এবং অধিকার আদায়ের প্রশ্নে তারাও হয়ে ওঠে প্রতিবাদী। আবার 'কতকগুলো কুকুরের আর্তনাদ' গল্পে এই প্রতিবাদ প্রতীকী ব্যঞ্জনায় ভাস্বর হয়ে উঠেছে। শহরের বেশ্যা থেকে শুরু করে সমাজের ভদ্রলোক সবাই যেন শেষ পর্যন্ত একাত্ম হয়ে উঠছে অন্যায়-অবিচার আর শোষণ-বঞ্চনার বিরুদ্ধে। 'অমর চলচ্চিত্রকার জহির রায়হানের চলচ্চিত্র সৃষ্টির মানসভঙ্গি প্রতিফলিত হয়েছে 'ইচ্ছার আগুনে জ্বলছি' নামক অসামান্য অণু গল্পটিতে। গণমানুষের প্রতি শ্রেণী সচেতন জহির রায়হানের নিমগ্ন অঙ্গীকারের স্বাক্ষর এ গল্পে পাওয়া যায়।' (মাহমুদুল, ২০১১ : ৩০) দুর্দশাগ্রস্ত, বিপন্ন, সর্বহারা নাগরিক জীবনের আখ্যান প্রতিভাসিত হয়েছে তাঁর গল্পে।

আন্দোলন-সংগ্রামে মধ্যবিত্ত শ্রেণির জীবন বিসর্জন যেমন পরিচিত ঘটনা আবার নিজের ব্যক্তিস্বার্থ হাসিলের জন্য জাতীয় স্বার্থ বিসর্জনের ঘটনাও অপ্রতুল নয়। 'অতি পরিচিত' গল্পে সেরূপ একটি চরিত্রের স্বার্থান্বেষী আচরণ প্রতিভাত হয়। পাকিস্তানি সামরিক শাসনের সমর্থন তথা দালালি করে আলোচ্য গল্পের চরিত্র ট্রলির বাবা নিজের অবস্থার প্রভূত উন্নতি করেছেন। 'গীটাঞ্জলী, ওহ! চমৎকার বই! মিল্টনের একখানা শ্রেষ্ঠ উপন্যাস।' (জহির, ২০১৩ : ৫৪১) এই যে ব্যক্তির জ্ঞানের বহর, সে পাকিস্তানি শাসকের আর্শীবাদপুষ্ট হয়ে সেন্ট্রাল এডুকেশন বিভাগের বড়কর্তা বনে যাচ্ছে। মাতৃভাষা এবং

মাতৃভূমি সবকিছু নিয়েই সে একটি বিদ্বেষী মনোভাব পোষণ করে এবং পাকিস্তান সরকারের সাথে তাল মিলিয়ে বলে ওঠে :

> আসলে কি জানো আসলাম, এদেশের ছেলেমেয়েগুলো সব গোল্লায় গেছে। উচ্ছন্নে গেছে সব। নইলে ইসলামি ভাষা ছেড়ে দিয়ে ওই কুফুরি ভাষার জন্য এত মাতামাতি কেন? কথা তখনো শেষ হয় নি ট্রলির বাবার। ইসলামি দেশে ইসলামি ভাষাই রাষ্ট্রভাষা হবে এতে কোনো সন্দেহ নাই। টেবিলে একটা প্রচণ্ড একটা ঘুসি পড়ল তার। দ্যাখো আসলাম আমি যা কিছু বলি থরো স্টাডি করেই বলি। আমি বলছি তোমায়। অনেক স্টাডি করে আমি দেখেছি। বাংলা ভাষার নিজস্ব ঐতিহ্য বলতে কিছুই নেই। (জহির, ২০১৩ : ৫৩৯)

জহির রায়হানের গল্পে নগরকেন্দ্রিক মধ্যবিত্ত সমাজের নারী-পুরুষ সম্পর্ক যেমন একদিকে ধরা দিয়েছে অন্যদিকে বর্ণনাবিন্যাসের মাঝে উঠে এসেছে সমকালীন প্রেক্ষাপটে নারীদের সংসার সীমান্ত অতিক্রম করে অগ্রসর হওয়ার ইতিহাস। সংকট এবং সংশয়ে পরিপূর্ণ মধ্যবিত্ত সমাজে নারী পালন করে সহায়ক ভূমিকা। পারিবারিক এবং সামাজিক বাধার কারণে নারীরা প্রায়শ বাধ্য হয়েছে তাদের কাজের পরিধি সংসারের চার দেয়ালের মধ্যে আবদ্ধ রাখতে। পুরুষের সকল কাজে সহায়ক হতে না পারলেও প্রতিবন্ধক হয়নি কোন নারী চরিত্র। 'হারানো বলয়' গল্পে মুনীর ভাইয়ের অবর্তমানে পুরো পরিবারের দায়িত্ব গ্রহণ করে আরজু। আর পরিবারের প্রতি কর্তব্য যথাযথভাবে পালনের নিমিত্তে আরজু ব্যক্তিজীবনের কামনা-বাসনা জলাঞ্জলি দেয়। ভালোবাসার মানুষের সাথে ঘর বাঁধার স্বপ্ন পূরণ হয় না তার। দাম্পত্য জীবনে অর্থনৈতিকভাবে পুরুষের পাশে এসে দাঁড়ায় 'ভাঙাচোরা' গল্পের টুনু। মফস্বল শহরে একার উপার্জনে চলা কষ্টকর, স্বামীর অর্থিক অসচ্ছলতার কথা চিন্তা করে গোপনে পিডব্লিউডির মেসে কাজ করতে দেখি টুনুকে। সংসারের ভার লাঘবের উদ্দেশ্যেই টুনু অক্লান্ত পরিশ্রম করে স্বামীর অজান্তে। স্বামী যদি তার কাজের কথা শুনে কষ্ট পায় এজন্যই কাজের কথা তার কাছে গোপন করে। শিক্ষিত হলেও 'অতি পরিচিত' গল্পের ট্রলির আচরণে সচেতনতার লেশমাত্র দেখা যায় না। নিজের স্বকীয়তার বিষয়ে কোনোরূপ ভাবনা-চিন্তা ব্যতিরেকে সে পিতার অবস্থানের গৌরবে নিজে গৌরবান্বিত হয় এবং পিতার দাপটে সে চালিত হতে চায়। আর তাই ট্রলি সবর্দা ব্যস্ত পিতার মিথ্যা প্রশংসায়। 'স্বীকৃতি' মধ্যবিত্ত নারীর পুরোযাত্রার ইতিহাস। সমকালীন উত্তাল রাজনৈতিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে পুরুষের পাশাপাশি নারীর সিদ্ধিলাভও চোখে পড়ে। লেখক এখানে নারীর অগ্রযাত্রার পথে বিভিন্ন বাধার স্বরূপ উন্মোচন করেছেন। নারীর উন্নতির পথে পুরুষ অনেক ক্ষেত্রেই পালন করেছে সহচর তথা সহায়কের ভূমিকা আবার নারীই কখনো কখনো নারীর উন্নয়নের পথে প্রতিবন্ধকরূপে আর্বিভূত হয়েছে। মনোয়ারা তার চলার পথে জামানকে সাথে পেয়েছে কিন্তু নিজের মেয়ের অগ্রযাত্রার পথে সে সাহায্যের হাত প্রসারিত করেনি। বরং বারবার ফিরিয়ে নিতে চেয়েছে সংসার নামক চৌহদ্দির মাঝে। 'ধিঙ্গি মেয়ে, আজ বিয়ে দিলে কাল ছেলের মা হবে, পুরুষদের মিটিংয়ে রূপ দেখাতে যাবেন উনি। মেয়ের মুখের উপর খুন্তি নাড়ে মনোয়ারা।' (জহির, ২০১৩ : ৫৩৭)

'নয়া পত্তন' গল্পে গ্রামের এক ভগ্ন স্কুলকে দাঁড় করানোর সংগ্রামের দৃশ্য উঠে এসেছে শনু পণ্ডিতের মাধ্যমে। প্রত্যক্ষভাবে না এলেও এ গল্পে নাগরিক সুবিধাবাদী, মধ্যবিত্ত

শ্রেণির মানুষের স্বরূপ এবং তাদের স্বার্থান্বেষী মনোভাব প্রকাশ পেয়েছে। স্কুলের জন্য সাহায্যের আশায় শনু পণ্ডিত সরকারের শিক্ষা বিভাগের বড় সাহেব শমসের খানের কাছে গেলে তিনি বলে ওঠেন,

> রাজধানীতে দুটো নতুন হোটেল তুলে, আর সাহেবদের ছেলেমেয়েদের জন্য একটা ইংলিশ স্কুল দিতে গিয়ে প্রায় কুড়ি লাখ টাকার মতো খরচ। ফান্ডে এখন আধলা পয়সা নেই সাহেব। অযথা বারবার এসে জ্বালাতন করবেন না আমাদের। পকেটে যদি টাকা না থাকে স্কুল বন্ধ করে বসে থাকুন। (জহির, ২০১৩ : ৫১০)

নগরীতে একের পর এক গড়ে উঠছে পাঁচ তারকা হোটেল, উচ্চ মধ্যবিত্ত শ্রেণির সন্তানদের জন্য গড়ে উঠছে ইংরেজি মাধ্যম বা ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল। আমলারা সরকার এবং উচ্চ শ্রেণির ধ্বজাধারী চাটুকারে পরিণত হয়েছে। গ্রাম বিমুখ এই মধ্যবিত্ত সমাজ নগরকেন্দ্রিক চাকচিক্য প্রতিষ্ঠায় আগ্রহী। কিন্তু গ্রামের শিক্ষা এবং অবকাঠামোগত কোনো উন্নয়নের দিকে তাদের কোনো আগ্রহ নেই। স্বার্থান্ধ এই শ্রেণি কেবল নিজেদের নিয়ে ব্যস্ত হয়ে গ্রামে ফেলে আসা শিকড়ের কথা ভুলে যায়।

মধ্যবিত্ত নাগরিক জীবনের বিশ্বস্ত রূপকার জহির রায়হান। একজন জীবনবাদী চলচ্চিত্রকারের নির্মোহ দৃষ্টিতে দেখা নাগরিক মধ্যবিত্ত জীবনের বহুমাত্রিক সংকট এবং অভীষ্ট অর্জনের চালচিত্র বিধৃত হয়েছে তাঁর ছোটগল্পে। এদেশের মাটি ও মানুষের সাথে তিনি ওতপ্রোতভাবে মিশেছিলেন এবং তাদের জীবনের অন্তর্লোক এবং বহির্লোকের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিবরণ তিনি হাজির করেছেন তাঁর ছোটগল্পে। কোনো কিছুর ভয় বা মোহ তাঁকে সত্য এবং ন্যায়ের পথ থেকে পিছু হঠাতে পারে নি। রাজনীতির মাঠে নির্ভীক কর্মী এবং সাহিত্যের জগতে সমাজসচেতন লেখক জহির রায়হান গ্রামীণ এবং নাগরিক জীবনের সকল প্রকার অসঙ্গতি দূর করে মঙ্গলময় এবং কল্যাণময় সমাজ গড়তে চেয়েছেন। মধ্যবিত্ত সমাজের মন-মনন, আচর-আচরণ সবকিছু সম্পর্কে তিনি তাঁর নিজস্ব মতামত দিয়েছেন। মধ্যবিত্ত শ্রেণির অবক্ষয়কে অনেক সমালোচক সংক্রামক ব্যাধি হিসেবে অভিহিত করলেও জহির রায়হান তাদের মধ্যে শুভ এবং অশুভ দুই বৈশিষ্ট্যই খুঁজে পেয়েছেন। মধ্যবিত্ত শ্রেণির সুবিধাবাদী মনোভাব যেমন তিনি দেখিয়েছেন আবার শোষণ-বঞ্চনার বিরুদ্ধে মধ্যবিত্ত শ্রেণিকে প্রতিবাদমুখরও করে তুলেছেন। নাগরিক মধ্যবিত্ত শ্রেণির আর্থ-সামাজিক অগ্রযাত্রায় নারীর অংশগ্রহণ এবং পুরুষের সহায়ক হিসেবে নারীর ভূমিকাও তাঁর গল্পগুলোতে জ্যোর্তিময় হয়ে উঠেছে।

গ্রন্থপঞ্জি

অদ্বৈত মল্লবর্মণ ২০০০। *রচনাসমগ্র*, [সম্পা. অচিন্ত্য বিশ্বাস], দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা।

আফজালুল বাসার ১৯৯৩। *বাঙলা সাহিত্য সমালোচনা*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

আবুল কাসেম ফজলুল হক ২০১২। *উনিশ শতকের মধ্যশ্রেণি ও বাংলা সাহিত্য*, জাগৃতি প্রকাশনী, ঢাকা।

এ. কে. নাজমুল করিম ২০০৮। *পরিবর্তনশীল সমাজ : ভারত, পাকিস্তান ও বাংলাদেশ* [অনু. রংগলাল সেন, জিনাত হুদা অহিদ, শিশির ঘোষ], দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ঢাকা।

কামরুদ্দীন আহম্মদ ১৩৭৬। *পূর্ব বাংলার সমাজ ও রাজনীতি*, স্টুডেন্টস পাবলিকেশন, ঢাকা।

জহির রায়হান ২০১৩। *রচনাসমগ্র*, অনুপম প্রকাশনী, ঢাকা।

টমাস বেবিংটন মেকলে ২০০৭। 'মিনিট অন দ্যা ইন্ডিয়ান এডুকেশন', *উপনিবেশবাদ ও উত্তর-ঔপনিবেশিক পাঠ*, [সম্পা. ফকরুল চৌধুরী], র‍্যামন পাবলিশার্স, ঢাকা।

তপন কুমার রায় ১৪১৬। 'জহির রায়হানের ছোটগল্প : সমাজবীক্ষণ'; *ভাষা-সাহিত্য পত্র* (পঞ্চত্রিংশ বার্ষিক সংখ্যা), [সম্পা.পৃথ্বিলা নাজনীন], বাংলা বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

বিনয় ঘোষ ২০০৯। *মেট্রোপলিটন মন . মধ্যবিত্ত . বিদ্রোহ*, ওরিয়েন্ট ব্ল্যাকসোয়ান, কলকাতা।

বিনয় ঘোষ ২০০৯। *বাংলার নবজাগৃতি*, ওরিয়েন্ট ব্ল্যাকসোয়ান, কলকাতা।

বিশ্বজিৎ ঘোষ ১৯৯১। *বাংলাদেশের সাহিত্য*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

বিশ্বজিৎ ঘোষ ২০০২। *বাংলা কথাসাহিত্য পাঠ*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

মনসুর মুসা ১৩৮১। *পূর্ব বাঙলার উপন্যাস*, পূর্বলেখ প্রকাশনী, ঢাকা।

মাহমুদুল বাসার ২০১১। *জীবনশিল্পী জহির রায়হান*, ষ্টুডেন্ট ওয়েজ, ঢাকা।

মুস্তাফিজুর রহমান ২০০৯। *বাংলাদেশের ছোটগল্পে মধ্যবিত্ত জীবনের রূপায়ণ ১৯৪৭-১৯৯০*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

মুহম্মদ ইদ্‌রিস আলী ১৯৮৫। *বাংলাদেশের উপন্যাস সাহিত্যে মধ্যবিত্ত শ্রেণী ১৯৪৭-৭০*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

মোঃ সরওয়ার মুর্শেদ ১৪১২। 'জহির রায়হানের উপন্যাসে শ্রেণীচেতনা', *ভাষা-সাহিত্য পত্র* (একত্রিংশ বার্ষিক সংখ্যা), [সম্পা. সৌদা আখতার], বাংলা বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

রফিকউল্লাহ খান ১৯৯৭। *বাংলাদেশের উপন্যাস : বিষয় ও শিল্পরূপ ১৯৪৭-৮৭*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৩৫০। *সঞ্চয়িতা*, বিশ্বভারতী, কলকাতা।

হাসান আজিজুল হক ২০১২। *শ্রেষ্ঠ প্রবন্ধ*, কথাপ্রকাশ, ঢাকা।

http://en.wikipedia.org/wiki/middle_class